খাদ্য নিরাপত্তায় বোরো মওসুমের অবদান

কৃষিবিদ মনির উদ্দিন

বাংলাদেশে ধান উৎপাদনে বোরো মওসুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিবছর প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয় এবং কম-বেশি ১৫.৫ মিলিয়ন টন চাল উৎপাদন হয়। উফশী বোরো এলাকা কম-বেশি ৩.৯ মিলিয়ন হেক্টর। মাঠ পর্যায়ে উফশী বোরো ধানের গড় ফলন ৫ টন/হেক্টর এবং ৪.০-৮.৫ টন/হেক্টর পর্যন্ত পাওয়া যায়। যথাযথ কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫ থেকে ২.০ টন বাড়ানো সম্ভব যা জাতীয় উৎপাদনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বোরো মওসুমের পরিবেশ উপযোগী ৩৫টি (৩১টি ইনব্রিড ও ৪টি হাইব্রিড) উফশী ধানের জাত এবং ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

বোরো মওসুমের জাতগুলোতে আলোক সংবেদনশীলতা নেই। মওসুম শুরু হয় শীত ও ছোট দিন দিয়ে, আর ফুল ফোটে গরমের শুরুতে এবং বড়ো দিনে । আলোক সংবেদনশীল কোনো জাত বোরো মওসুমে আবাদ করা যায় না ।জীবনকাল অনুসারে বোরো মওসুমের জাতগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদি (১৫০ দিনের বেশি) ও স্বল্প মেয়াদি (১৫০ দিনের কম) এ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ।দীর্ঘ মেয়াদি জাত হলো বিআর ১৪, বিআর ১৬, ব্রি ধান ২৯, ব্রি ধান ৫৮, ব্রি ধান ৫৯ ও ব্রি ধান ৬০ ইত্যাদি।স্বল্প মেয়াদি জাত হলো ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮১, ব্রি হাইব্রিড ধান২, ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ব্রি হাইব্রিড ধান৫ ইত্যাদি। এছাড়াও ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬১ এবং ব্রি ধান৬৭ লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত। এগুলো সম্পূর্ণ জীবনকালে মাঝারি মাত্রার (৬-৮ ডিএস/মি.) লবণাক্ততা সহনশীল । দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যেসব এলাকায় লবণাক্ততা রয়েছে সেখানে এ জাতগুলো চাষাবাদ করা হয় । ব্রি ধান৬৭ লবণাক্ত অঞ্চল ছাড়াও অনুকূল পরিবেশে চাষাবাদ উপযোগী এবং অধিক ফলনশীল । এ জাতগুলো থেকে লবণাক্ততার মাত্রাভেদে হেক্টরে ৩.৮-৭.৪ টন ফলন হয়ে থাকে এবং এদের গড় জীবনকাল ১৪৫ দিন। ব্রি ধান৫০ (বাংলামতি) এবং ব্রি ধান৬৩ বাসমতির মতো চিকন লম্বা ও জনপ্রিয় এবং রপ্তানিযোগ্য। ব্রি ধান৫০ এ হালকা সুগন্ধি আছে এবং ব্রি ধান৬৩ এর চাল সরু ও গুণাগুণ বালাম চালের মতো। যেসব এলাকায় রাবার হলারে ধান ভাঙ্গানো সম্ভব নয় সেসব এলাকায় ধান সিদ্ধ করে সাধারণ মেশিনে ভাঙ্গানো যায় এবং এতে চাল ভাঙ্গে না ।

এছাড়া ব্রি ধান ৮১ নতুন উদ্ভাবিত উচ্চ মাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ ও ঢলে পড়া সহনশীল জাত। এ জাতের চাল বাজারে প্রচলিত জিরাশাইলের চালের মতো। আর এর আকার আকৃতি বাসমতির মতো লম্বা ও চিকন থাকায় এটি বিদেশে রপ্তানিযোগ্য । এর জীবনকাল ১৪০ থেকে ১৪৫ দিন এবং অনুকূল পরিবেশে এটি সর্বোচ্চ ৮.০ টন/হে. ফলন দিতে সক্ষম। বোরো মাসুমের জাতগুলোর উপযুক্ত রোপণ সময় ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি। যেসব জাতের জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার কম সেগুলোর বীজ বপন করতে হবে ১৫ নভেম্বরের পর এবং যে জাতগুলোর জীবনকাল ১৫০ দিনের বেশি সেগুলোর বীজ ১ নভেম্বর থেকে বীজতলায় বপন শুরু করার উপযুক্ত সময় । ভালো ফলন পেতে হলে বোরো ধান অবশ্যই জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের মধ্যে রোপণ শেষ করতে হবে। কোনো কারণে বীজতলায় বীজ বপন বিলম্বিত হলে (যেমন- জমি থেকে পানি সরতে দেরি হলে) ড্রামসীডার দিয়ে সরাসরি রপন পদ্ধতি অনুসরণ করলে রোপণের তুলনায় ধান ৭-১০ দিন আগে পাকে।

সাধারণত বোরো মওসুমে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে লবণাক্ততার পরিমাপ বেশি সেখানে আগাম বীজতলায় বীজ ফেলে আগাম রোপণ করলে ফুল আসার সময় (মার্চ ও এপ্রিল) লবণাক্ততাজনিত ক্ষতি থেকে ধানকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এ জন্য বোরো মওসুমে ওই এলাকায় ১৫ নভেম্বরে বপন ও ২৫ ডিসেম্বর রোপণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি) এবং গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি) রাখা ভালো। তবে অবস্থাভেদে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি (৮-১০ ইঞ্চি) ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫-২০ সেমি (৬-৮ ইঞ্চি) করা যায়।

সাধারণত আবহাওয়া ও মাটির উর্বরতার মান যাচাই এবং ধানের জাত, জীবনকাল ও ফলন মাত্রার উপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা ঠিক করা হয়। ১৫০ দিনের বেশি দীর্ঘ মেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ইউরিয়া ডিএপি/টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা (মনোহাইড্রেট) যথাক্রমে ৪০, ১৩, ২২, ১৫ ও ১.৫ কেজি হিসাবে প্রয়োগ করতে হয়। জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি, অর্ধেক এমওপি, জিপসাম ও দস্তা প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সমানভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করা হয়। প্রথম কিস্তি জমি চাষের শেষ পর্যায়/১৫-২০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি সাধারণত গুছিতে কুশি দেখা দিলে (প্রথম কিস্তির ২০-২৫ দিন পর) এবং তৃতীয় কিস্তি কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। বাকী অর্ধেক এমওপি তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ১৫০ দিনের কম (স্বল্প মেয়াদি জাত ব্রি ধান৫০ ও ব্রি ধান৫৮) এর ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ইউরিয়া, ডিএপি/টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও

দস্তা (মনোহাইড্রেট) যথাক্রমে ৩৫, ১২. ২০, ১৫ ও ১.৫ কেজি প্রয়োগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পরে, এক তৃতীয়াংশ চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর এবং এক তৃতীয়াংশ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি চাষের শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হয়।

হাওর অঞ্চলের জাতের জন্য (দীর্ঘ মেয়াদি বিআর১৭, বিআর১৮ ও বিআর১৯) ইউরিয়া, ডিএপি/টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা (মনোহাইড্রেট) বিঘা প্রতি ২৭, ১২, ২২, ৮ ও ১.৫ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে রোপণের ১৫,২০ ৩০, ৩৫ এবং কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। অন্যান্য সার উপরে উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। কাইচথোড়ে পরেও যদি নাইট্রোজেনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমওপি সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্ধেক/দুই তৃতীয়াংশ সার জমি তৈরির সময় ও বাকী অর্ধেক/এক তৃতীয়াংশ সার ২য়/৩য় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে ধানে পোকা ও রোগবালাই কম হয় এবং ধানের দানা পুষ্ট হয় ও ফলন বাড়ে।

বোরো ধানে সাধারণত দুইবার এবং সর্বোচ্চ তিনবার হাত দিয়ে আগাছা দমন করতে হয়। প্রথমবার রোপণের ১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০/৩৫ দিন পর। যদি জমিতে আগাছার পরিমাণ বেশি হয় তবে রোপণের ৪৫/৫০ দিন পর তৃতীয়বারের মত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে ধানের দুই সারির মাঝের আগাছা দমন হয় । কিন্তু দু গুছির ফাঁকে যে আগাছা থাকে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। যান্ত্রিক আগাছা দমনের জন্য অবশ্যই সারিতে ধান রোপণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ধান রোপণের ১৫-১৮ দিনের মধ্যে জমিতে স্বল্প পানি থাকা অবস্থায় মাঠে যন্ত্র চালাতে হবে এবং পরে রোপণের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে একবার হাত নিড়ানির প্রয়োজন হবে ।

বোরো মওসুমে ধানের প্রধান রোগসমূহের মধ্যে নেক ব্লাস্ট অন্যতম। নেক ব্লাস্ট ধানের একটি মারাত্নক ছত্রাকজনিত রোগ। ধানের ফুল আসার পর শিষের গোড়ায় এ রোগ দেখা দেয়। বোরো মওসুমে সাধারণত ব্যাপকভাবে নেক ব্লাস্ট রোগ হয়ে থাকে। শিষের গোড়ায় বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। শিষের গোড়া ছাড়াও যেকোনো শাখা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত শিষের গোড়া পচে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে ।এ রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এ রোগের আক্রমণ প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা যায় না। কৃষক যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি সনাক্ত করেন, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় অনুমোদিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলেও রোগ দমন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয় । যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি, অথচ উক্ত এলাকায় রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার সাথে সাথেই অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন ট্রপার (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) অথবা ট্রাইসাক্লাজল গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৬ লিটার পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকেলে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার আগাম স্প্রে করতে হবে ।ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পায় । হাওর অঞ্চলে বোরো মওসুমে ধানের স্বাভাবিক ফলন ব্যাহত হওয়ারর অন্যতম একটি কারণ বান ক্ষেতে পোকার আক্রমণ। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ধানের জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের পোকার আক্রমণ হতে পারে। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে সব পোকার আক্রমণে ধানের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

কর্মক্ষেত্রের বিচারে কৃষিখাত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশ। কৃষিতে সরকারের মনোযোগের কারণে চালের উৎপাদন বেড়েছে।' নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং কৃষি উৎপাদন সহায়ক নীতিকৌশল কৃষি খাতে বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন প্রকার ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, চাষাবাদ প্রযুক্তি আবিষ্কার, উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, সুলভ মূল্যে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে খাদ্য সংকট মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে কৃষিকে আরও বহুমুখীকরণ, অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদন এবং আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক সংকট সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেছে।

#

পিআইডি ফিচার